সংবাদ

তারিখ ২৭/১১/১২
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

শনিবারের বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষাদান জোরদার

আফর আহমদ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ফিরে

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে স্কুল থেকে ঝরেপড়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদান জোরদার করা হচ্ছে। যেসব শিশু দরিদ্র, পারিবারিকভাবে লেখাপড়ায় অনুৎসাহী ও বাড়ি থেকে দূরত্বের কারণে স্কুল ছেড়েছে- এসব শিশুকে স্কুলে ফিরিয়ে এনে পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের সহায়তায় রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় এসব শিশুদের শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আশরাফুল ইসলাম সংবাদকে জানান- উপজেলার গরিব, দুস্থ ছেলেমেয়েরা যারা আর্থিকভাবে অসচ্ছলসহ এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল ছেড়েছে তাদের ফিরিয়ে এনে অনানুষ্ঠানিক ৮০টি আনন্দ স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের সহায়তায় রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় এসব স্কুলের প্রতিটিতে ৩৫ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। তাদের বয়স ৮ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। পাঠগ্রহণকালীন এসব ছাত্রছাত্রীকে মাসে ১০০ টাকা, বই খাতা ও পোশাকের জন্য টাকা দেয়া হয়। তিনি শিশুদের পৃষ্ঠা ১৫ ক ৪

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আনন্দ স্কুলের সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করছে -সংবাদ

শিশুদের শিক্ষাদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, এসব স্কুলে স্থানীয় এইচএসসি বা ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াশোনা করা নারী মহিলারা শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে দেয়া হয় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব। স্কুল হিসেবে তাদেরই অতিরিক্ত ঘর বা কম ভাড়ার ঘরকে বেছে নেয়া হয়েছে। এসব ঘরের জন্যও ভাড়া দেয়া হয়। স্কুলের সময় নির্ধারণ করা হয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে- যাদের স্কুলে পড়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই, বাড়ি থেকে স্কুল দূরে, দুর্গমে, পরিবারে লেখাপড়ার সুফল সম্পর্কে অবগত লোকজন না থাকা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসহ নানা কারণে যেসব শিশু স্কুল ছেড়েছে তাদের খুঁজে বের করে শিক্ষা দেয়া হয়। লেখাপড়ার চাপ ও খরচ কম হওয়ার কারণে এসব শিশু এ অনানুষ্ঠানিক স্কুলে ফিরে আসছে। লেখাপড়াও করছে।

চুয়াডাঙ্গার এসব স্কুল ঘুরে দেখা গেছে স্কুলগুলো স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে পরিচালিত হচ্ছে। এসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকেই পরিচালনা পরিষদ নির্বাচিত হয়ে থাকে। কোন কারণে ছাত্রছাত্রী স্কুলে না এলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে ক্লাসে আনা হয়। এসব কাজ সাধারণত স্কুলের শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা করে থাকেন। আর উপর থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার কখনো সরেজমিনে, কখনো কখনো ফোনে স্কুলের খোঁজ খবর নেন। পাশাপাশি আনন্দ স্কুলের কাছে সাধারণ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা যুক্ত আছেন, তারা যে কোন সময় সেখান থেকে সহযোগিতা নিচ্ছেন।

সরেজমিনে আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপাড়া আনন্দ স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে ২১ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। একজন ছাত্রীকে পড়া দেখিয়ে দিচ্ছেন শিক্ষক মোসাম্মৎ হাজেরা খাতুন। অন্য ছাত্রছাত্রীরা আওয়াজ করে লেখাপড়া করছে। তিনি জানালেন, ভর্তির সময় এখানে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। এসব ছেলেমেয়ে অধিকাংশ ছিল ভূমিহীন কৃষক, কাঠমিস্ত্রি, নাইটগার্ড, রিকশাভ্যান চালক, ঝাড়ুদার, ঋষি, সাপুড়ে, কোলসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়ে। এদের মধ্যে কেউ কেউ পড়ালেখার সময়েই স্কুল ছেড়ে বিভিন্ন পেশাতে যোগ দিয়েছে। কেউ বিয়ে করে স্কুল ছেড়েছে। প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি ছেলেমেয়ে এখনও এভাবে লেখাপড়া করছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ সমাপনী পরীক্ষায় পাস করে হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার কথা জানায়।

স্কুলের ছাত্র সাকিল এই প্রতিবেদককে জানায়- তার বাবা রাজমিস্ত্রি। বাবার রোজগার দিয়ে দুই ভাই-বোন ও বাবা-মা'র সংসার চলে না। এজন্য সে এ স্কুলে পড়তে এসেছে। স্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে গ্যারেজে কাজ শেখে। যদি সে ভালো লেখাপড়া করতে পারে তাহলে পড়াশোনা শেষে চাকরি নেবে। যদি তা না পারে তাহলে গ্যারেজে স্থায়ী হয়ে যাবে। একই অবস্থা হৃদয় ও রাসেলের। তারা সবাই বাবা-মা'র সামর্থ্য না থাকার কারণে সাধারণ স্কুলের পরিবর্তে এসব স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সবার স্বপ্ন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া।

এরশাদনগর আনন্দ স্কুলে গিয়ে দেখা যায় সেখানেও একদল ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। শুরুতে এ স্কুলে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। এখন সেখানে ছেলেমেয়ে ও স্কুল বেড়েছে। স্কুলটির শিক্ষিকা জাহানারা খাতুন জানালেন, এখন যারা লেখাপড়া করছে সবাই ভালো করছে এবং সবাই পঞ্চম শ্রেণী পাস করবে। এ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা স্কুলের সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। আগে যারা বিভিন্ন কারণে স্কুল ছেড়েছিল এখন তারা এ অনানুষ্ঠানিক স্কুলে পড়াশোনা করে প্রতিযোগিতা করছে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত সাধারণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। এদের মধ্যে প্রায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীর সমান বৃত্তি পাচ্ছে। তারা অধিকাংশই চায় প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাস করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবে। অনেকেই উচ্চতর লেখাপড়া শিক্ষা নিতে চায়।

আনন্দ স্কুল সূত্র জানায়, প্রথম পর্যায়ে সারাদেশের ৬০টি উপজেলায় আনন্দ স্কুলে শিক্ষা দেয়া হতো। পরে আরও ৩০টি বৃদ্ধি করে মোট ৯০টি উপজেলার ২৩ হাজার স্কুলের মাধ্যমে এসব শিশুর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এসব স্কুল থেকে ২০০৯ সালে প্রথম সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৫ হাজার ৬৫৯ জন, পাসের হার ৪৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ। ২০১০ সালে ছিল ৭৬ হাজার ৬৪৯ জন, পাসের হার ৪৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এবং ২০১১ সালে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৮ হাজার ৪৫৯ জন, পাসের হার ছিল ৭৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এ বছর পাসের হার আরও বাড়বে বলে জানান স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, প্রকল্পের শুরুতে কিছু অনিয়ম ও ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল খারাপ হলেও এখন তা উন্নতি হয়েছে। এ প্রকল্প অব্যাহত থাকলে সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করবে।

প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাংক প্রথম পর্যায়ে ২০০৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রথম পর্যায়ে কার্যক্রম সমাপ্তির পর বর্তমান প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৩ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।